বেলা অবেলার কথা

ভাণভট্টের ষাইট্টা ধান! আমরা কী ফিরে পেতে পারি?

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ভাণভট্টকে আমি খুব একটা বেশিদিন ধরে জানি না। তিনি সংস্কৃত ভাষার কবি এবং ঔপন্যাসিক। ৭ম শতকের। ভারতের বিহার প্রদেশের ছাপড়ায় তার জন্ম। কিছুদিন কনৌজে গিয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬- ৬৪৭ খ্রি.) সভাকবি হিসাবে কাজ করেন। পরে এক সময় নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। তবে সম্রাটকে ভুলে যাননি। তাকে নিয়ে হর্ষচরিত নামে এক কাহিনীকাব্য লেখেন। অবশ্য সেটা তার জীবনের শেষ দিকে। সম্রাটের জীবনভিত্তিক রচনা হলেও তিনি তা স্বাধীনভাবে রচনা করতে পেরেছিলেন। কারণ তখন আর রাজকবির গুরুভার তার কাঁধে ছিল না। হর্ষচরিতে সম্রাটের বোন রাজশ্রী বোধহয় হারিয়ে যায়। সেটা নাটকের কাহিনীর প্রয়োজনে এসেছিল নাকি সত্যি ঘটনা ছিল তা বিতর্কের বিষয়। তবে সম্রাট তাতে কিছু মনে করেননি। নিজের জীবনচরিত পড়ে নাকি তিনি বাণভট্টকে পুরস্কৃত করেছিলেন। যাহোক এই হর্ষচরিতেই আছে- রাজশ্রীর সন্ধানে সম্রাট বিন্ধ্যাটবী নামে এক বনসমৃদ্ধ অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় গ্রামীণ জীবনের মুখোমুখি হন। সাধারণ চাষিদের সংস্পর্শে আসেন। জানতে পারেন, চাষিরা এক ধরনের ধানের আবাদ করেন যা 'ঠিক' ষাট দিনে পাকে। আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ছাত্র নই। তবে শৈশবে কয়েক বছর 'দেবভাষা দীপিকা' আর 'ব্যাকরণ কৌমুদী' নাড়াচড়া করার কারণে মাঝে মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ বা আলোচনা- সমালোচনা পড়তে ভালোবাসি। আর তা যদি চাষ- আবাদ সংক্রান্ত হয় তাহলেতো কথাই নেই। এমনি একটি বিষয় পড়তে গিয়েই চোখে পড়ল বাণভট্টের অভিজ্ঞতার কথা। তাহলে কী সত্যি ৬০ দিনের ধানের জাত ছিল? গ্রামের মানুষ যে এখনও বলে যাইট্টা, হাইট্টা বা ষাটে ধান এক সময় ছিল। এমনকি ধানের নির্দিষ্ট জাতের নাম উচ্চারণ করে বলে ষাটে- বোয়ালে। আমার এক দিদিমার কাছে আমি এ নামটি শুনেছি। কুষ্টিয়ার খোকশা অঞ্চলে চাষ হতো নাকি এক সময়। যদিও আমার কাছে এক সময় মনে হয়েছে সম্ভব না। যেমন আমাদের আবহাওয়ায় (উষ্ণ এবং অবউষ্ণ) ধানের থোড় গজানো থেকে ফুলফোটা এবং ফুলফোটা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত গড়ে তিরিশ দিন করে কমবেশি ষাট দিন লাগে। বিজ্ঞানীরা বলেন, জাত বা মৌসুম নির্বিশেষে এ সময়টি অবশ্যই ৬০ দিন হতে হবে। তবে আমাদের আউশ মৌসুমে ধান পাকার বেলায় কিছুটা কম সময় লাগে। তাহলেও তো পঞ্চাশ দিনের কম হওয়ার কথা না। আর চারা গজানো থেকে বাড়- বাড়তি পর্যন্ত যদি ৩০ দিনে শেষ হয় তাহলে হয়তো ৮০ দিনে ধান ঘরে তোলা সম্ভব। যেমন দেশি আউশের বেলায় দেখি। হাসিকলমি (ঢাকা নং ২৬), হরিণমুড়া (ঢাকা নং ২৮) এবং ধলা ষাইট্টা (ঢাকা নং ৩২ : জেনেটিক স্টক ৫২৬), দুলার (ঢাকা নং ২২)। ৮০ দিনে পাকে। আর সব কাছাকাছি আউশের জাতগুলো হলো চারনক (ঢাকা নং ৬), পুসূর (ঢাকা নং ১৮), মরিচবটি (ঢাকা নং ২৪), ধলা ষাইট্টা (ঢাকা নং ৩০: জেনেটিক স্টক ৫২৭)। এগুলোর জীবনকাল সর্বোচ্চ ৮৫ দিন। আর পাশপাই (ঢাকা নং ২০), কুমারী (ঢাকা নং১৬), ধারিয়াল (ঢাকা নং১৪) ৮৫- ৯০ দিনের মধ্যে ঘরে আসে। তবে পুখি (ঢাকা নং ৮), আতলাই (ঢাকা নং ১০), কটকতারা (ঢাকা নং ২) এবং সূর্যমুখী (ঢাকা নং ৪) জাতগুলোর ধান পাকতে ১০০ দিন লাগে। এসব জাতগুলোর ফলন তেমন বেশি ছিল না। বিঘাপ্রতি ৭ থেকে বড়জোর ৯ মন। একেতো দেশি এবং ঢলে পড়া স্বভাবের দুর্বল ধাঁচের গাছ। তার ওপর সময় কম নেয় মাঠে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ধলা ষাইট্টা তো ৬০ দিনে হচ্ছে না, ৮০ দিন হচ্ছে। তাই আমার ধারণা ৬০ দিনে ফুল আসে বলেই বোধহয় এমন ধরনের নাম দেয়া হয়েছে। তবে যে বাণভট্টের ভাষায় 'ঠিক' ষাট দিনে পাকে, তার কী হবে? এমন তো হতে পারে যে জাত ছিল ৮০ দিনেরই। বিশ দিনের চারা লাগানো হয়েছে। তারপরে মাঠে ছিল ৬০ দিন। এভাবে তো ৮০ দিন লাগে। কিন্তু সেটাই বা কীভাবে সম্ভব? লাগানোর ধকল কাটিয়ে উঠতেও কমপক্ষে সপ্তাহখানেক লাগে। তাহলে তো মাঠে ৬০ দিনে চলে না। বাণভট্টই বলেছেন সেখানে কোদাল দিয়ে ছোট ছোট জমি কুপিয়ে আবাদ করা হয়। কঠিন কালো মাটি ও জঙ্গলের বাড়বাড়ন্ত মেনে নিয়ে চাষিরা চাষ করে। অতএব ধান সেখানে জমি কাদা করে লাগানো হয়েছে বলে মনে হয় না। কেন যেন মনে হয় বাণভট্টের যাইট্টা ধান ধুইল্যা- বাইন করা জাত।

প্রাবন্ধিক করুণাসিন্ধু দাসের বর্ণনা অনুযায়ী (সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দ্রষ্টব্য) বাণভট্টের বর্ণনায় কোন কমতি বা দুর্বলতা নেই। তার বর্ণনার গ্রামীণ জীবন অনেকটাই কালের প্রেক্ষাপটে বেশ প্রাণবন্ত। যেমন বাণভট্ট তার বন্ধু- বান্ধবদের বাড়িতে শ্যামধান ও নীবার ধান (ভিন্ন প্রজাতির ধান, এখনও জংলি ধান হিসাবে পাওয়া যায়), কুশের আঁটি, যজ্ঞের কাঠ, শুকনো গোবর, গরুবাছুর, ডুমুরের ডালপালা ইত্যাদি পরিচিত দৃশ্য দেখেছিলেন। যাগযজ্ঞ, বেদপাঠ, ব্যাকরণের কথটকাচালি আলোচনা ও প্রতিযোগিতা, ন্যায় শাস্ত্র, কাব্য আলোচনা সবই তার বর্ণনায় আছে এবং নিখুঁতভাবেই আছে। তাই কীভাবে বলি যে বাণভট্ট ধানের জীবনকাল নিয়ে ঠিক কথাটি বলেননি? তবে কিছুটা অতিকথন থাকতে পারে। অতিকথন সব কালেই ছিল এবং এখনও আছে।

এবার একটু ভিন্নভাবে বলি। আমি ধরে নিচ্ছি বাণভট্ট ঠিকই বলেছিলেন। যাট বা কিছু বেশি দিনের ধানের জাত তখন ছিল এবং সেটা ছিল আউশের জাত। বা হয়তো আউশের মত কোনো বুনো ধানের জাত। প্রশ্ন উঠতে পারে, এখন সেগুলো নেই কেন? উত্তর

সোজা। কারণ ফলন কম থাকায় চাষিরা কালক্রমে সেগুলোর বীজ আর রাখেনি। এখন যেমন কম ফলনের দেশি ধানের জাতগুলোকে বেশিরভাগ চাষিরা আর সংরক্ষণ করতে চায় না বা করে না। অর্থাৎ যুক্তির খাতিরে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এক সময় ৬০ দিনের এক প্রকারের ধানের জাত ছিল। তবে ফলন নেহায়েত কম ছিল বিধায় কালের স্রোতে তা হারিয়ে যায়। তবে জাতটি হারিয়ে গেলেও এ ধরনের জাত বা জাতগুলোর স্বল্পজীবনকালের বৈশিষ্ট্য যে হারিয়ে যাবে এমন নয়। কারণ জাতগুলোর মধ্যে কিছুটা হলেও ইতর- পরাগায়ন হয়ে থাকে এবং এভাবেই স্বল্পজীবনের জিন প্রচলিত জাতগুলোর জীবনধারার কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি; আমরা যদি দরকার মনে করি তাহলে এ জিন বা বৈশিষ্ট্য আবার খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমাদের নিকট অতীতের বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি না পারলেও কিছুটা অন্তত পেরেছেন। যেমন ১০০ দিনের সূর্যমুখী এবং ১০০ দিনের পুখি সংকরীকরণ করে ৮৫ দিনের পুসূর জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। মাত্র দুটি জাতের মধ্যে হয়তো অল্প কিছু ক্রস করেই তখনকার ব্রিডার তার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। সম্ভবত তিনি কিছুটা ভাগ্যবান ছিলেন। এখন যদি লক্ষ্যটিকে নতুন করে ঠিক করা যায়। যেমন ধানের জীবনকাল ৮০ থেকে কমিয়ে ৬০ দিনের কাছাকাছি আনা। এখানে ফলনের বিষয়টি না হয় পরে দেখা যাবে। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ৬০ দিনের না হোক ৭০ দিনের একটি জাত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কারণ একটি আঙ্কিক যুক্তি বলছে-

ঝহ খ ; হ ? ঘ যখন ঘ একটি সীমীত সংখ্যা। ঝহ দিয়ে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অবস্থান বুঝানো হয়েছে। যেমন এখানে এই বৈশিষ্ট্য হলো ধানের জীবনকাল। তাকে যদি আমরা খ বা স্বল্প (৬০) দিনে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের সংকরীকরণে ব্যবহৃত জাতের সংখ্যা হ হতে হবে সীমিত সংখ্যা ঘ এর সমান বা তার চেয়েও বেশি। অর্থাৎ ক্রসিং প্রোগ্রামে ব্যবহৃত জাতের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কাজটি বেশ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। এ কাজে সহজে ফল পাওয়া যাবে না। তবে কিছু বিজ্ঞানী যদি নিরন্তর চেষ্টা করে যায় তাহলে অবশ্যই কিছু ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গবেষণা এখন খুবই বিলাসী মার্গের বলে মনে হতে পারে। তবে হাতে নেয়ার এখনই সময়। আমরা চাচ্ছি স্বল্পজীবনকালীন ধানের জাত। আমাদের অল্প দিনে বেশি ফলন দরকার। আমাদের সারাবছরে একক জায়গায় বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট, বেশি পরিমাণ প্রোটিন, বেশি পরিমাণ তেলজাতীয় পদার্থ, বেশি পরিমাণ ক্যালরি, বেশি পরিমাণ পুষ্টি এবং বেশি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এখন সেই চিন্তা করতে হবে। পাশাপাশি জমির উর্বরতাও ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজেন শুধুমাত্র উর্বরতা ধরে রাখার জন্য বিশেষ ফসলের আবাদ করতে হবে। বছরে কমপক্ষে তিনটি ফসল, একই সময়ে জমিতে বিভিন্ন স্তরে আলোর সদ্ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকৃতির ফসল আবাদ করতে হবে। এজন্য সব ফসলেরই স্বল্প জীবনকালীন জাত উদ্ভাবন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ধানের বেলায় একাজটি বোধ হয় শুরু হয়েছে বেশ আগেই। যেমন বোরো মৌসুমে এক সময় প্রধান জাত বিআর৩- এর জীবনকাল ছিল ১৭০ দিন। এখন একটি জনপ্রিয় বোরো ধান ব্রিধান২৮- এর জীবনকাল ১৪৫ দিন। সম্ভবত কিছুকালের মধ্যে সামান্য কিছু ফলন স্যাক্রিফাইস করে হলেও আমাদের বোরোর জাত আসছে ১৩৫ দিনের। বা এমন হতে পারে শস্যপর্যায়ের কারণে বোরো প্রতিষ্ঠা একটু দেরিতে করা হলেও ফলন তেমন কমবে না অথচ জীবনকাল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমে যাবে। যেমন ব্রি ধান৫৮ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে লাগালে এর জীবনকাল নেমে আসবে ১২৫ দিনে অথচ ফলন স্বাভাবিকের তুলনায় খুব একটা কমে যাবে না। রোপা আমন বিআর১১ এর জীবনকাল ১৪৫ দিন। এখন একই মৌসুমে এর জন্য গ্রহণ উপযোগী ফলনের জন্য উদ্ভাবিত ব্রি ধান৬২ এর জীবনকাল মাত্র ১০০ দিন। ব্রি উদ্ভাবিত আউশের জাত ব্রি ধান৪৮ এর জীবনকাল ১১০ দিন। একই সময়ের জন্য বোনা আউশ ব্রি ধান৬৫ এর জীবনকাল সর্বোচ্চ ১০০ দিন। আমাদের চেষ্টা আছে। দেশি আউশের জাত যেহেতু ৮০ দিনে হয়। এ জাতগুলোর ফলন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সেটা সম্ভব হলে খুবই ভালো। আবার যদি জীবনকালটি ৮০ দিন থেকে আরও কমিয়ে আনা যায় তাহলেতো আরও ভালো। এজন্য ব্রিডারদের এবং আরও সব বিজ্ঞানীদের নিরলস কাজ করে যেতে হবে।

শেষ কথা। বাণভট্টের কথায় কিছুটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে আমি বলেছি। তবুও তর্কের খাতিরে তা সত্যি বলে ধরে নিলাম এবং তা উদঘাটনের জন্য আমাদের কিছু বিজ্ঞানীকে কাজ করতে বলেছি। আমি বিশ্বাস করি, তারা নিকট ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো জাত আমাদের দিতে পারবে না। সেটা আমি আশাও করি না। কিন্তু ভালো কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য তাদের থেকে আমরা পাব। যা দিয়ে সত্যিকারের যাইট্টা যদিও বা না পাই তবে যাট দিনে ফুল আসে এবং আশি দিনে ঘরে আনা যায় এমন ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত আমরা অবশ্যই পাব। এজন্য কিছুটা সময় আমাদের নিতেই হবে।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]

-